**ATMADEEP**
An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
Volume-I, Issue-II, November, 2024, Page No. 120-130
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.02W.016**

# রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাস্তুভিটা’

**ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য,** *সহযোগী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 14.10.2024; Accepted: 27.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https:..creativecommons.org.licenses.by.4.0.)

***Abstract***

*Bijan Bhattacharya and Tulsi Lahiri, and the other being Digindra Bandyopadhyay, are the three names associated with the Bengali 'Gananatya Andolan' that are mentioned in the same breath. Playwright Digindra Chandra Banerjee was born on July 5, 1908, in Adabari, Vikrampur, Dhaka District, East Bengal, undivided Bengal. Being a child of lower middleclass family. Drama and politics have been involved in Digindrachandra's life since the beginning. However, even though he kept pace with the anti-British national politics of the time for a period of his life, he did not tread the path later. But drama remained an integral part of his life forever. A large part of childhood and adolescence was spent in Adabari. And there, after seeing the theater in Durgamandap, a deep passion for drama was born. Non-cooperation movement was going on in the country while studying in Malkhanagar. The mind of the thirteen-year-old boy became agitated. The movement despises education Joined*

*Digindrachandra had a rebellious nature from childhood. So whenever he got any such movement, he jumped on it, so he joined the Congress civil disobedience movement in 32. Perhaps this nature of his made him enthusiastic about the communist ideology. He did not withdraw from the world of Bengali drama amid hundreds of marital problems. He passed away on April 12, 1990 AD. He has written about 20 complete plays, about 35-36 in total. There were also half a dozen children's dramas. His notable play 'Vastuvita'*

*The protagonist of the play 'Bastuvita' (1947) wanted to remain in his paternal bhadras, clinging to his Pathshala as a means of housing and livelihood, even after the creation of Partition-based East Pakistan. Hujuge did not want to leave Mete Bast. But where the country has been divided on the basis of religion, in front of the aggressive sectarian animosity, he had to leave his home in the end. Even though some of his Muslim friends were quite sympathetic to him, how long can the sand dam survive the black waves of the sea? And my article is about this play. Under the pressure of political situation, many Bengali families have to come and start living in different states like Tripura, Assam, West Bengal in India. Apart from that, many Bengali families had to die at the hands of Muslims when their sons ran away from home, an attempt has been made in this article to analyze the various aspects.*

**Key words:** political context, contemporary movement, middle-class society-family, partition, coordination.

বাংলা 'গণনাট্য আন্দোলনে'র সঙ্গে যুক্ত যে তিনটি নাম একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হয়, তাদের দু'জন বিজন ভট্টাচার্য ও তুলসী লাহিড়ী, অপর নামটিই দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নাট্যরচনা প্রচেষ্টা বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সাহিত্যাধ্যাপক এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের রসজ্ঞ লেখক ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় দৃষ্টিতে বলেছেন :

> "সাম্প্রতিক নাট্যকারদের মধ্যে যাহারা বাংলা নাটককে ভাব-বিলাসহীন বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন তাহাদের মধ্যে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্রণী। যুদ্ধোত্তর বাঙালী জীবনে যে সব প্রশ্ন ও সমস্যার আবর্ত-বিপ্লব দেখা দিয়াছে সেইগুলিই তাহার নাটকের পটভূমিতে বলিষ্ঠ রূপরেখায় অঙ্কিত হইয়াছে। সেজন্য আর্থিক সঙ্কট, শ্রমিক ও মালিক বিরোধ, মেকি জাতীয়তা, সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বন্দ্ব প্রভৃতি অনিবার্যভাবেই তাহার নাটকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ....নাটক রচনা তাহার পক্ষে আর্টের বিলাস নহে তাহা দুঃখব্রত সত্যসন্ধিৎসা। পরিবেশ রচনা, বাস্তবানুগ সংলাপপ্রয়োগ, আবেগ-দ্বন্দ্বের বৈদ্যুতিক চাঞ্চল্য এবং ক্ষিপ্রগতি ঘটনার মধ্য দিয়া তিনি তাঁহার নাটকে সার্থক নাট্যরস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।"[১]

নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম তাঁর ১৯০৮-এর ৫ জুলাই, অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের আদাবাড়িতে। নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দিগিন্দ্রচন্দ্রের জীবনে নাটক আর রাজনীতি প্রথম থেকেই জড়িত। তবে জীবনের একটা পর্ব পর্যন্ত তৎকালীন ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পা মিলিয়ে চললেও, পরে আর ও পথ মাড়াননি। কিন্তু নাটক তাঁর জীবনে আমৃত্যু এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দেখা দিয়েছিল। বাল্য ও কৈশোরের অনেকটা অংশ কেটেছিল আদাবাড়িতে। আর সেখানেই দুর্গামণ্ডপে থিয়েটার দেখে দেখে নাটকের প্রতি জন্মে গিয়েছিল গাঢ় অনুরাগ। তিনি একটু বড় হতে চলে আসেন পিতৃভূমি পাউলদিয়াতে। ভর্তি হন মালখানগরে, পরে সেখান থেকে রাজদিয়া হাইস্কুল। ১৯২৮-এ ম্যাট্রিক পাশ করেন, দু-দুটো বিষয়ে লেটার নিয়ে। মালখানগরে পড়ার সময় দেশে চলছে অসহযোগ আন্দোলন। তেরো বছরের কিশোরের মন তাতে উদ্বেল হয়ে উঠল। পড়াশোনা তুচ্ছ করে আন্দোলনে সামিল হলেন।

আদাবাড়িতে থাকবার সময়ে নাটক দেখতে দেখতে অভিনয়ের নেশা পেয়ে বসল কিশোর দিগিন্দ্রচন্দ্রকে। রাজদিয়া স্কুলে পড়ার সময় সহপাঠীদের নিয়ে নাটক করার ইচ্ছে জাগল। কিন্তু তেমন জমল না। মহান সাহিত্যিকদের সাহিত্য পড়ে তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে নাটককে। তাই নিজেই শরৎচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সব রচনার নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাঁরই নেতৃত্বে মঞ্চস্থ হল 'মেজদিদি', 'রামের সুমতি', 'পরিণীতা'র মতো অমর কাহিনি। ম্যাট্রিক পাশের পর ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকার বিখ্যাত জগন্নাথ কলেজে। সারা কলেজ দাপিয়ে বেড়ানো ছেলেটি তখন ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারি। ঠিক এই সময় ১৯৩০-এ বাপুজির ডাকে আইন অমান্য আন্দোলনে উত্তাল হয়ে উঠল সারা দেশ। স্থির থাকতে পারলেন না দিগিন্দ্রচন্দ্র। তার ফল বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেপ্তার ও দেড় বছরের কারাদণ্ড। ১৯৩১-৩২ সাল কাটে তাঁর দমদম সেন্ট্রাল জেলে। জেলের মধ্যে চুপচাপ বসে ছিলেন না তিনি। রীতিমত পড়াশোনা করেছেন, আর করেছেন নাট্যচর্চা। সহবন্দি নিয়ে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে নাটক মঞ্চস্থ করেছেন রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা'। জেলে বসেই তিনি লেখেন 'আহুতি'। এই নাটক তাঁর নাট্যকার জীবনের এক মোড়। এতদিন তাঁর নাট্যচিন্তাকে আচ্ছন্ন করে ছিলেন বাংলা সাহিত্যের দিকপালরা, এ নাটক থেকে তাঁর সেই ঘোর কাটল। নাটকে নতুন যুগের বার্তা বহনের কথা ভাবতে লাগলেন তিনি। তবে সে-ভাবনা রূপ পেতে মাঝে কেটে গেল একটা যুগ। ১৯৩৩-এ কারামুক্তি ঘটল তাঁর।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আর কখনো রাজনীতিতে ফিরে আসেননি। মাসখানেক বাড়িতে কাটিয়ে পড়াশোনার পাট চুকিয়ে চলে এলেন কলকাতায়। শুরু হল তাঁর আত্মবিস্তারের পর্ব। জীবিকার তাগিদটাই তখন বড়ো। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একাধিক সংবাদপত্রের অফিসে তাঁকে চাকুরি নিতে হয়েছে। অবশেষে থিতু হলেন 'আনন্দবাজার'-এ। এখানে সাংবাদিক হিসেবে ছিলেন ১৯৫৩ সালের নভেম্বর অব্দি। বোধহয় শ্রমিক ইউনিয়ন করবার অপরাধে কর্তৃপক্ষের রোষ-নজরে পড়ে বরখাস্ত হন। এরপর বাকি জীবনটা দিগিন্দ্রচন্দ্রের আর্থিকভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটে। তবুও শত সাংসারিক সমস্যার মধ্যে পড়েও বাংলা নাটকের জগৎ থেকে তিনি সরে আসেননি। দিগিন্দ্রচন্দ্র প্রয়াত হন ১৯৯০ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল। লিখে গেছেন খান কুড়ির মতো পূর্ণাঙ্গ নাটক, একাঙ্ক প্রায় ৩৫-৩৬টি। এছাড়া রয়েছে দেড় ডজন শিশুনাটক।

নাট্যসংগঠক হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। 'গণনাট্য সংঘ'-এ যোগ দেন ১৯৪৬ সালে। নাট্যশাখার সম্পাদক থেকে ধীরে ধীরে হন সংঘের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সভাপতি। পরে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হলে দিগিন্দ্রচন্দ্র গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করেন। যতদিন দায়িত্বে ছিলেন সংগঠনটিকে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন শহর থেকে গ্রামের দিকে। সহযোগী কয়েকটি নাট্য সংগঠন নিয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাট্যোৎসব করার। ১৯৪৯-এ গড়ে তোলেন 'নাট্যচক্র'। কেবল নাটক অভিনয় নয়, শিল্প-সাহিত্যের অন্য দিক নিয়েও এই সংগঠনটি চর্চা করত। এর তিন বছর পর নবনাট্য আন্দোলনের অগ্রণী পথিক 'অশনি চক্র'-এর সৃষ্টি হয় দিগিন্দ্রচন্দ্রের হাত ধরে। ১৯৫৬ সালে 'নাটমহল' নামে এক নাট্যসংস্থার জন্ম দেন। এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য ছিল তরুণ নাট্যোৎসাহীদের অভিনয় বিদ্যায় পারদর্শী করে তোলা। নাট্যকারদের নিয়ে সংগঠন বানান ১৯৫৮-য়, নাম দেন 'নাট্যকার সংঘ'। এই সংগঠনটি নাট্য আন্দোলন ও নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রতিবাদে ছিল সোচ্চার। সবশেষে গড়ে তোলেন 'গণসংস্কৃতি সংঘ'। সেটা ১৯৭০ সালে। তিনি ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। এই তথ্যগুলির সূত্রেই বলা যায়, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নাট্যঅন্তঃপ্রাণ এক ব্যক্তিত্ব। মানুষের প্রতি সংবেদনশীল, তার বিপন্নতা ও সংকটের প্রতি সহানুভূতিশীল। এই নিঃসীম দরদ তাঁকে মার্কসবাদের প্রতি আগ্রহী করে তোলে এবং শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য কলম ধরতে উদ্বুদ্ধ করে।

তাঁর লেখায় Socialist realism-এর ছাপ গভীরভাবে মুদ্রিত। তিনি সারাজীবন দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, অন্যায় অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। তাই সংগ্রামী মেহনতি মানুষদের জন্য আবেগ, সহানুভূতি, দরদ নাট্যকারের কলমের মুখ দিয়ে ঝরে পড়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখতেন তিনি। নাটকে যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই প্রগতিশীল মানসিকতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। ১৯৪৩-এ রচিত 'দীপশিখা' নাটকে একদিকে মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ প্রভাবে কৃষক-জীবনের বিপর্যস্ত জীবন ও অন্যদিকে কৃষক-আন্দোলনের সহায়তার সমস্যা-সমাধানের জন্য আন্দোলন। এটিতেও কম্যুনিস্ট প্রভাব বর্তমান।

তাঁর রচিত প্রথম নাটক 'অন্তরাল' ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও প্রথম অভিনীত হয় '৪৪-এ। নাটকের এক অংশে শ্রমিক-মালিক বিরোধ এবং ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মার্ক্সবাদী মতকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রচেষ্টা এবং অন্য অংশে কানীন সন্তান ও কুমারী মাতার সমস্যায় লেখকের মানবিকতাবোধ ও সামাজিক ন্যায়নীতি-বোধের প্রতিই আগ্রহ প্রকাশ পায়।

পরবর্তী নাটক 'তরঙ্গে' একদিকে কৃষক-বিপ্লবের সহিংস আন্দোলন এবং অপর দিকে কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলন—উভয়ের ব্যাপকতা পারস্পরিক বিরোধ এবং মাঝেমধ্যে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চিত্র মিলে মিশে রয়েছে।

১৯৪১-এ রচিত 'মোকাবিলা' নাটকে মুখ ঘুরিয়েছেন মধ্যবিত্ত পরিবারের উপর। বাইরের রাজনৈতিক সংঘাত কীভাবে একটা পরিবারকে সমূহ বিপর্যয়ের মুখে ফেলে কীভাবে তাদের বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেছে, তারই বিশ্বস্ত, বিবরণ।

'মশাল' নাটকে (১৯৫৪) মূলত পুঁজিবাদী মিল মালিকদের প্ররোচনা, সাম্প্রদায়িক সমস্যা এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার চিত্র ফুটিয়েছেন। কিন্তু এতে রয়েছে একদেশবর্তিতা—দীর্ঘকাল পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা, অবিশ্বাস, জমিদার শ্রেণী এবং মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার চিত্র অনুপস্থিত।—এগুলি ছাড়াও দিগিন্দ্রচন্দ্র 'জীবনস্রোত'-আদি নাটক এবং অসংখ্য 'একাঙ্কিকা' রচনা করেছিলেন। যেমন—'বেওয়ারিশ' (৪৭), 'একাঙ্ক সপ্তক', 'অভিনব একাঙ্কগ্রন্থ', 'পাকাদেখা', 'পুনর্জীবন', 'দাম্পত্য কলহে চৈব', 'সীমান্তের ডাক' প্রভৃতি। সর্বহারার মানবতাবাদ তাঁকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করেছে। তাঁর নাট্যবিষয় গৃহীত হয়েছে সমকালের সমাজ-বাস্তবতা থেকে। স্বাধীনতা লাভের প্রাক্কালে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, জন্মভূমির মাটি থেকে শিকড় উপড়ে চলে আসার মর্মান্তিক যন্ত্রণা তাঁর নাটকে বারবার বিষয় হিসেবে দেখা দিয়েছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে দেশের অন্যান্য সমস্যা, মেকি স্বাধীনতার স্বরূপ ও সর্বোপরি নরনারীর হৃদয়-রহস্য তাঁর নাটকগুলিতে যত্নের সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে।

'বাস্তুভিটা' (১৯৪৭) নাটকের নায়ক বঙ্গবিভাগ-জাত পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টির পরও বাস্তুভিটা এবং জীবিকা সংস্থানের উপায় তার পাঠশালাটিকে আঁকড়ে ধরে পৈতৃক ভদ্রাসনেই থেকে যেতে চেয়েছিলেন। হুজুগে মেতে বাস্তু ত্যাগ করতে চান নি। কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে যেখানে দেশভাগ হয়েছে, সেই আগ্রাসী সাম্প্রদায়িক বিরূপতাকে সামনে রেখে তার শেষ পর্যন্ত বাস্তুত্যাগ করতেই হলো। তার কোন কোন মুসলমান বন্ধু তার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল থাকা সত্ত্বেও সমুদ্রের কালোচ্ছাসের ধাক্কায় বালির বাঁধ আর কতক্ষণ টিকতে পারে? আর এই নাটকের বিষয় নিয়েই আমার উক্ত প্রবন্ধ। রাজনৈতিক পরিস্থিতির চাপে পড়ে অজস্র বাঙালি পরিবার কীভাবে ওপার বাংলা থেকে এবার বাংলায় অর্থাৎ ভারতবর্ষের ত্রিপুরা, অসম, পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যে এসে বসবাস শুরু করতে হয়েছে। তার বাইরেও কত বাঙালি পরিবারকে বাড়ি-ঘর ছেলে পালিয়ে আসার সময় মুসলমানদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে, তারই বিভিন্ন দিকগুলো বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

'বাস্তুভিটা' নাটকের রচনাকাল ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে আগস্ট; প্রথম অভিনয় হয় ১৫ অক্টোবর ১৯৪৭, দীপায়ন সংঘ কর্তৃক ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। বই হিসেবে বেরিয়েছিল ওই বছরেই। ১৯৪৭ সাল আমাদের দেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী বৎসর। আক্ষরিক অর্থেই। ১৭৫৭-র পলাশির যুদ্ধ থেকে ধরলে ১৯৪৭-এ শেষ হচ্ছে ব্রিটিশ শাসনের ১৯০ বছরের একটি জমানা, যা ঔপনিবেশিকতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। বাংলা তথা ভারতের ক্ষেত্রে এটা আধুনিক যুগও বটে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে ব্রিটিশ শাসন বিদেশি শাসন, যার প্রতি পদে লাঞ্ছনা অপমান অত্যাচার। এগুলি পরাধীনতার লজ্জাচিহ্ন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে স্বদেশ-চেতনার বীজ অঙ্কুরিত হলেও, তা ক্রমশ বৃক্ষে রূপান্তরিত হতে থাকে ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের পর। প্রায় নব্বই বছর একটানা আন্দোলন চালিয়ে অবশেষ জয়লাভ। ১৯৪৭-এর ১৪ আগস্টের মধ্যরাত্রে অবসান ঘটছে ১৯০ বছরের এক অপশাসনের। ভারতবর্ষ লাভ করছে তার কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। দেশ জুড়ে অভূতপূর্ব উন্মাদনা, সানন্দ উল্লাস। কিন্তু এ কোন্ স্বাধীনতা, কাদের স্বাধীনতা! স্বাধীনতার আগে-পরের কান্না-ঘাম-রক্ত ঝরার ইতিহাসটাকে মনে রাখলে স্বাধীনতার সব আনন্দ তেতো হয়ে যায়। অনেক মৃত্যুর মিছিল পেরিয়ে আমরা পৌঁছাই এক খণ্ডিত দেশের রক্তাক্ত ভূখন্ডে। স্বাধীনতার প্রাক্কালে তৈরি হয় হিন্দু-মুসলমানের ভেতর পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস, হানাহানি, একে অন্যকে নিঃশেষ করে দেবার নিষ্ঠুর মানসিকতা। স্বাধীনতা জন্ম দেয় দুই স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের-হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান। ধর্মের

ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে দুই নিকটবর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের প্রাচীর তুলে দেওয়া হয় রাতারাতি। ইতিহাসই বলছে, এসব ঘটনার পিছনে ছিল কিছু মুষ্টিমেয় মানুষের লোভ, দর্প, অহমিকা, স্বার্থসাধনের গোপন অভিলাষ। কিন্তু দেশভাগের বলি হল যারা তাদের কথা খুব একটা ইতিহাসে লেখেন না। দিগিন্দ্রচন্দ্র সেই বিপন্ন ত্রস্ত আতঙ্কিত শিকড়-ছেঁড়া মানুষদের নিয়ে, তাদের দুঃখ কষ্ট আর্তিকে ঘিরে লিখলেন 'বাস্তুভিটা'র মতো বাস্তব-নির্ভর এক সামাজিক নাটক, যার পরতে পরতে লুকিয়ে আছে দেশভাগের ফলে প্রায় ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষদের অকথ্য যন্ত্রণা।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সূত্র ধরেই বুঝতে পারা যায় যে, কিছু স্বার্থান্বেষী রাজনৈতিক নেতার হঠকারিতায় দেশভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছিল। যারা ধর্মান্ধ ও সম্প্রদায়গত ভাবে আত্মকেন্দ্রিক তারাই ছিলেন দ্বিজাতিতত্ত্বের সমর্থক এবং ধর্মের জিগির তুলে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্মাদনা ছড়িয়ে দিতে তাঁরা ভুল করেননি। অথচ দেশ দ্বিখন্ডিত হলে সবচেয়ে সংকটে পড়ে সাধারণ মানুষ, যারা ধর্ম নিয়ে কখনই মাতামাতি করে না; যারা সুভদ্র সামাজিকতায় সুদীর্ঘকাল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নিয়ে পাশাপাশি বসবাস করে এসেছে। নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্রের মূল লক্ষ্য এদের জীবন, এদের সমস্যা, এদের সংঘাত ও সমন্বয়। নাটকে মহেন্দ্র অধিকারী ও তাঁর পরিবার এই অভিজ্ঞতাকে রূপ দিতে ব্যবহৃত।

মোট সাতটি দৃশ্যে বিন্যস্ত এ নাটকে পূর্ব পাকিস্তানে থাকা হিন্দুদের জীবনের অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধের অভাবজনিত আতঙ্ক ও সংকটের পটভূমিতে বিপন্ন মানুষের জন্মভূমির প্রতি নিদারুণ মায়া ও অপরিসীম টান বর্ণিত হয়েছে। দেশভাগ হলে সাধারণ মানুষের চেতনায় এই বোধ কাজ করতে থাকে যে, বিধর্মী হিসেবে এখন তারা এদেশে অবাঞ্ছিত। সুতরাং যে-কোনো সময়েই তাদের আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা। তাই জান-মান-ইজ্জৎ রক্ষার তাগিদে এতদিনের স্বদেশ ছেড়ে চলে আসাটা স্বাভাবিক এবং একই সঙ্গে বেদনাদায়ক। এই বেদনার বাণী বহন করে নিয়ে এসেছে 'বাস্তুভিটা'নাটক। যারা রাজনৈতিক কৌশলে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করল, তাদের মধ্যে জন্ম নিল বিজয়ীর অহমিকা, গড়ে তুলল অসহিষ্ণু উদ্ধত মনোভঙ্গি। বিধর্মীদের দেশ থেকে তাড়াতে পারলেই যেন তারা বাঁচে। তাদের নির্দয়তা কখনো কখনো চরম নৃশংসতার রূপ নেয়। বিধর্মীদের ওপর আক্রমণ কিংবা অত্যাচারের কালে তারা একবারও ভাবে না পূর্বের সম্প্রীতি সৌহার্দ্যের কথা। মনুষ্যত্বকে গলা টিপে মেরে তখন তারা পরিণত হয় ধর্মান্ধ নরঘাতকে। এ নাটকে তাদেরও উপস্থিতি দেখিয়েছেন নাট্যকার। বস্তুত নাটকটি দাঁড়িয়ে আছে এই দুই শ্রেণির মানুষের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও তাদের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ওপর।

নাট্যকার নাটকের সূচনায় রাখেন পূর্ববাংলা থেকে কলকাতায় পালিয়ে যাবার টুকরো ছবি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়ে গেছে, তাই এদেশ আজ হিন্দুর কাছে নিরাপদ নয় বুঝে চৌধুরি, মুখুজ্যে, মিত্তিররা একের পর এক চলে যাচ্ছে সীমানার ওপারে পশ্চিমবাংলায়। মহেন্দ্র অধিকারী একেবারেই সাধারণ স্তরের ছাপোষা নিম্ন মধ্যবিত্তের গেরস্থ মানুষ। তিনি গ্রামের নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত। স্ত্রী মানদা আর কন্যা কমলাকে নিয়ে তাঁর নিত্য অভাবের সংসার। তিনি স্কুলের বেতন পাননি কয়েকমাস। তাতে সংসারের অবস্থা আরও সঙ্গীন হয়েছে। সুতরাং মহেন্দ্রের পক্ষে অন্য সকলের মতো দেশগাঁয়ের বাড়িঘর ছেড়ে হঠাৎ চলে আসা সম্ভব নয়। মানদা এতটা বুঝতে চান না। তাঁর যত ভাবনা কন্যা কমলাকে নিয়ে। উঠতি বয়েস তার, সুতরাং মুসলমান যুবকদের নোংরামির ভয়ে সর্বদা সিঁটিয়ে থাকেন তিনি। তাই মান্দার উক্তিতে পাওয়া যায় —

১। "ভাবনা তো আমাদের জন্য নয়, ভাবনা মেয়েটার জন্যে। পুকুর-ঘাটে ওর যাবার উপায় নেই, দেখলেই মোল্লাবাড়ীর ছেলে দুটো যা তা ইশারা করে।"[২]

২। "না থাকবে না, সব দেবতা হয়ে যাবে! তোমার মাস্টারিবুদ্ধি রাখ। মেয়েদের ওরা কবে সম্মান দিয়েছে!"[৩]

৩। "...পাকিস্তান পেয়ে যেন ওরা আরো মাথায় চড়ে বসেচে!"[৪]

দেশভাগের পর পরিস্থিতি যে অনেক বদলে গেছে সেটা চর্মচক্ষু দিয়েই বুঝতে পারেন এবং এ ব্যাপারে অন্ধ স্বামীর চোখ ফোটানোর দুর্মর চেষ্টা করেন মানদা।

মানদা প্রতিবেশী হিন্দু গেরস্থদের দেশ ছেড়ে পালানোর সংবাদ দিয়ে আতঙ্কিত হয়ে স্বামীর কাছে জানতে চান, —

"গ্রাম ছেড়ে সবাই চলে গেলে আমরা থাকব কি করে?"[৫]

এ প্রশ্নে মহেন্দ্র নির্বিকার। কারণ তাঁর কোনো গত্যন্তর নেই। যে আর্থিক সংগতি অন্যদের চলে যেতে ভরসা যোগাচ্ছে মহেন্দ্রর তা নেই। সুতরাং তিনি স্ত্রীকে বলেন,—

"পাকিস্তান হোক, গোরস্থান হোক, এখানেই আমাদের থাকতে হবে। গরীবের যাবার জায়গা আছে নাকি?"[৬]

এমনই অকূল সমুদ্রে যেন কূল খুঁজে গেলেন মানদা। প্রতিবেশী মিত্তির বাড়ির শচীন এসে হাজির হল এসময়। শচীন অনেকদিন হল গাঁ ছেড়েছে। সে থাকে কলকাতায় তার স্ত্রী ও বিধবা মাকে নিয়ে। কলকাতার সাম্প্রতিক গণ্ডগোলে তাদেরকে শ্বশুরবাড়ি ধানবাদে পাঠিয়ে এখন এসেছে দেশে। জন্মভূমির টানে নয়, অন্য উদ্দেশ্য আছে তার। দেশভাগের ফলে তাদের বাস্তুভিটে, জমি-জিরেত সব এখন পাকিস্তানে পড়েছে। এ সম্পদ এবার বেহাত হবে। তার আগেই সে বেচে দিয়ে যতটুকু যা পাওয়া যায় সেই পাওনা-গণ্ডা নিয়ে চিরতরে জন্মভূমি ছাড়তে চায়। শচীনই এখন মানদাদের লোভ দেখায়, আশ্বাস দেয় ভিটেমাটি ছেড়ে তার সঙ্গে কলকাতায় চলে যেতে। ডুবন্ত মানদা যেন স্রোতের মুখে কুটো খুঁজে পান। কিন্তু মহেন্দ্রর তাতে সায় নেই। কারণ তিনি জেনেছেন, এখানকার বড় ঘরবাড়ি-পুকুর-খামার বিক্রি করে যা পাওয়া যাবে সে টাকায় কলকাতায় সাকুল্যে কাঠা দুই জমি মিলতে পারে। এছাড়া মহেন্দ্র এখান থেকে পা ওঠাতে নারাজ আরও একটি বড় কারণে। তিনি গাঁয়ের পাঠশালাটির একমাত্র শিক্ষক। তিনি চলে গেলে পাঠশালাটাই চিরতরে উঠে যাবে, এখানকার ছেলেপুলেদের পড়াশোনা মাটি হবে। তাই মহেন্দ্রের কণ্ঠে শুনা যায় বেদনাপূর্ণ আর্তনাদ, —

"মাস্টারি ক'রে তো চুল পাকালাম-কিন্তু পেট ভরেচে কোনদিন। তশীলদারীটা ছিল বলেই যে-ভাবে হোক এতদিন সংসার চালাতে পেরেচি। তা ব'লে মাস্টারিকে আমি কোনদিনই ঘৃণা করিনি।... গবরমেন্ট আর মাইনে দিচ্ছে কতদিন-তার আগেও তো কত ছেলে আমার কাছে বিনে মাইনেয় পড়ে যেত।"[৭]

মানদা স্বামীর এসব কথা শুনে ক্ষুব্ধ হন, অভিমান করেন, করেন তীক্ষ্ণ বিদ্রুপও। মহেন্দ্রর একাকী ভিটে পাহারা দেবার কথা শুনে মানদা শচীনকে সাক্ষী মেনে বলেন, —

"শুনলে ত বাপু কথার ধরণ। থাক ওর ভিটে নিয়ে ও পড়ে- মেয়েকে নিয়ে আমি তোমার সঙ্গে যাব"[৮]

কিন্তু 'যাব' বললেই মানদার যাওয়া হয় না। মহেন্দ্রও থাকেন না একই অবস্থানে। তাঁর মধ্যে দোলাচলতার সৃষ্টি হয়। নাট্যকার একাধিক ঘটনায় মহেন্দ্রর দোদুল চিত্তকে স্পষ্ট করেছেন। গ্রামের অবস্থাপন্ন মাতব্বর কৃষক সোনা মোল্লার ছেলে খালেক জোর করে মহেন্দ্রর আমগাছের আম পেড়ে নিয়ে যায়। নালিশ জানাতে মহেন্দ্র যান সোনা মোল্লার কাছে। কিন্তু কোনো প্রতিকার হয় না তার। তিনিও একটা সময় বুঝতে পারেন

দেশকালের আগেকার পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পালটে যাচ্ছে যেন, নতুন করে ভাবতে হবে সব কিছু। আর শচীন নিত্য প্ররোচনা দিয়ে যায় সাপের চেয়েও ক্রুর বিশ্বাসঘাতক মুসলমানদের বিরুদ্ধে, অতীত ইতিহাসের নজির তুলে প্রমাণ করতে চায় এই জাতটার খুনি স্বভাব। তাই সে বলে,

> "...সাপকে বিশ্বাস করতে আছে মাস্টারকাকা, তবু এ জাতকে বিশ্বাস করতে নেই। এদিকে আপনার কাছে এসে ভাল মানুষটি সাজছে, ওদিকে দেখুন গিয়ে তলে তলে লীগের পান্ডাগিরি কচ্ছে।"[৯]

কিন্তু মুসলমান প্রতিবেশীদের দীর্ঘদিনের সহাবস্থানে থাকা আদর্শবোধে উদ্বুদ্ধ মহেন্দ্রর মন সেকথা মানতে চায় না। তাঁরই এক শিক্ষক-বন্ধু মক্তবের মাস্টার আমীন মুনশির সঙ্গে তিনি নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে অকৃত্রিম আন্তরিকতায় গল্প করেন, সুখ-দুঃখের কথা বলেন, আমীনের ছেলে অসুস্থ হলে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও গভীর রাত্রিতে তার চিকিৎসা করতে যান। এসব ব্যাপারে তিনি কারুরই কোনো বারণ মানেন না, কারণ মহেন্দ্রর মধ্যে কাজ করতে থাকে দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের জন্য দরদ, সহানুভূতি ও গভীর একাত্মতা। তার কাছে দেশভাগ কতকগুলো স্বার্থান্বেষী নেতার শয়তানি। এতে দেশের মানুষের অন্তরকেই দু'ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ভাবা হয়নি সাধারণ মানুষের সুবিধা-অসুবিধা, সুখ-দুঃখ, সুদীর্ঘকালে গড়ে-ওঠা প্রীতির বন্ধনের কথা। তাছাড়া মহেন্দ্র গাঁ ত্যাগ করতে পারেন না তাঁর তুলনায় আরো নীচুস্তরের গরিব-পূর্বোদের কথা ভেবে। নিজেরা কোনোক্রমে পালিয়ে গেলেও রতনের মতো হতদরিদ্র জেলে কিংবা মহানন্দের মতো নিরতিশয় অভাবী গ্রাম ভাষিরা তো কোনো মতেই ভিটে ছেড়ে যেতে পারবে না। তাদের এই অসহায়তা মহেন্দ্রকে পীড়িত করে।

'বাস্তুভিটা' নাটকটি মুলত হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। মধ্যযুগ থেকেই এই দুই বিরুদ্ধ ধর্মের মানুষ পাশাপাশি বাস করে এসেছে। সম্পর্ক কখনো গরম, কখনো নরম। দুই ধর্মেরই গোঁড়া ধর্মধ্বজীরা নিজেদের সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষকে বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীদের সম্পর্কে হিংস্র প্ররোচনায় উত্তেজিত করেছে। আবার কোথাও কোথাও একত্র সহাবস্থানের ফলে তাদের ভিতর গড়ে উঠেছে পারস্পরিক নির্ভরতা, সম্প্রীতি। এ নাটকে মহেন্দ্র ও শচীনের কথোপকথন থেকে ইতিহাসের সেই অতীত অধ্যায়ে গিয়ে পৌঁছুই আমরা, আর শচীন ও সোনা মোল্লার উত্তপ্ত বাক্-বিনিময়ে ধরা পড়ে স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পূর্ববর্তী সময়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের চেহারা। মহেন্দ্রর চোখে শত অনৈক্যের মাঝখানেও হিন্দু-মুসলমানের প্রীতির সম্পর্কটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে শচীন আর সোনা মোল্লার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে দুই বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসীর পার্থক্য, সামাজিক ভেদ এবং তার সূত্রে শত্রুতা। শচীন ভয়ংকরভাবে মুসলমান বিদ্বেষী। সে মধ্যযুগের রাজনৈতিক ইতিহাসের দৃষ্টান্তে বুঝতে চায় বর্তমান কালের মুসলমানদের চরিত্র। দেশভাগের পিছনে সে দায়ী করে মুসলমানদের লোভ, স্বার্থপরতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা। কিন্তু এই স্বভাব গড়ে ওঠবার নেপথ্যে হিন্দুদের কোনো দায়কে সে স্বীকার করে না। অন্যদিকে সোনা মোল্লা মুসলিম লিগের সমর্থক হলেও পুরোপুরি হিন্দু-বিদ্বেষী নন। সামাজিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক কেন খারাপ হল, এর পিছনে উল্লাসিক হিন্দুদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ কতটা দায়ী, তিনি তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করেছেন। মুসলিম লিগের হিন্দু-বিদ্বেষের অন্তরালে দেখেছেন মুসলমানদের তিক্ত অভিজ্ঞতা, হিন্দু সমাজপতিদের দ্বারা নিগৃহীত ও অপমানিত হওয়ার বেদনাকর ইতিহাস। তার মতে, পাকিস্তানের দাবি উঠেছে সেই নিগ্রহের আঁতুড়ঘর থেকে। মহেন্দ্র আছেন এই দুই মেরুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে। তাঁর সঙ্গে আমীন মুনশি, কফিলদ্দি, রতন, মহানন্দরা। এদের ভিতর কোনো সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি নেই, রয়েছে কেবল বেঁচে থাকার কঠোর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামী চেতনার কাছে হার মেনেছে সাম্প্রদায়িক অনিষ্টবুদ্ধি। শেষ অবধি এ নাটকে জয় হয় শুভচেতনার। অনেক টানাপোড়েনের পর মহেন্দ্রকে তাঁর এতদিনের বাস্তুভিটে ছাড়তে দেয় না সেখানকার

মুসলমানরাই। শেষ দৃশ্যের উপান্তে হৈ-হট্টগোল, আনন্দ কলরোলের মাঝখানে কখন যে নিঃশব্দে চম্পট দেয় ভেদবুদ্ধির অধিকারী শচীন, তা কারও ঠাহর হয় না। গোঁড়া মুসলমানদের নেতৃত্বে পরিচালিত মুসলিম লিগ যে পূর্ববঙ্গের ইসলাম-বিশ্বাসী মাত্রকেই ধর্মান্ধ করে দেয়নি, তার প্রমাণ দেয় এ নাটক। ১৯৫৪ সালে নাটকটির দ্বিতীয় সংস্করণের মুখপত্রে 'স্মারক' শীর্ষক ক্ষুদ্র রচনায় নাট্যকার এই প্রসঙ্গটির সূত্র ধরে লিখেছেন, —

> "ভারতবিভাগের পরে কারো কারো মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল লিগ-নেতৃত্বের চাপে একেবারেই যন্ত্রবৎ হয়ে গিয়েছে, তাদের শুভবুদ্ধির উদয় আর কোনদিনই হবে না। জনসাধারণ থেকে যাঁরা দূরে এবং তাদের প্রতি যাঁদের আস্থা নেই তারাই এরূপ যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তাধারা যে বিজ্ঞানসম্মত ছিল না, পূর্ববঙ্গের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফলই আজ তা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত কচ্ছে।... পূর্ববঙ্গে জনগণের জয়যাত্রায় আজ যে আলো স্বতঃভাত, ক্ষীণ হলেও 'বাস্তুভিটা' রচনার সময় তারই দিকে অঙ্গুলি সংকেতের চেষ্টা করেছিলাম। আজ সেখানে 'আমীন মুন্সী', 'কফিলদ্দি'রই জয় এবং এই জয়ে আমিও গর্ব অনুভব কচ্ছি।"[১০]

অর্থাৎ লেখকরা যে ক্রান্তদর্শী হয়ে থাকেন, তার আরও একবার প্রমাণ পাওয়া গেল এ নাটকে। 'বাস্তুভিটা'র মর্মকথায় প্রতিধ্বনিত হল এই সত্য: দেশভাগের প্রাক্কালে সাম্প্রদায়িক স্বার্থশিকারিরা ইষ্টবুদ্ধির দ্বারা চালিত ছিলেন না; আর জনসাধারণের শক্তিই গণতন্ত্রের শেষকথা, ক্ষমতাতন্ত্রের চোখ রাঙানি দিয়ে সেই শক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখা যায় না।

'বাস্তুভিটা' শব্দটি দুটি পদের সমাহার-বাস্তু ও ভিটা। বস্ ধাতু জাত 'বাস্তু' বলতে বোঝায় বসতি বা বাসস্থান; আর ভিত্তি থেকে ভিত, তা থেকে 'ভিটা' কথাটির উৎপত্তি। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটির সামগ্রিক অর্থ হল বাসস্থানের ভিত্তিভূমি। কিন্তু দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাটকে কেবল এই অর্থেই শব্দটিকে ব্যবহার করেননি, এর অন্য তাৎপর্যও অভিব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। নাটকটি যেভাবে আরম্ভ হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, দেশভাগের ফলে পুববাংলা ছেড়ে দলে দলে হিন্দুরা চলে আসছে পশ্চিমবাংলায়। তারা ছেড়ে আসছে তাদের ঘরবাড়ি, পুকুর-খামার, জমি-জিরেত, এমনই আরো কত পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। স্থাবর ছাড়া অস্থাবর সম্পত্তিরও অনেক কিছু ফেলে আসতে বাধ্য হচ্ছে তারা। তাদের কাছে এসব সম্পদের তুলনায় জীবনের মূল্য বেশি। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র মহেন্দ্র অধিকারী পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দুদের একজন। কিন্তু তাঁর পরিস্থিতি আর সকলের মতো নয়। তিনি একটি পাঠশালার পণ্ডিত হলেও তাঁর সাংসারিক অবস্থা তেমন নয়, যাতে এই সংকটে স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে কলকাতায় পাড়ি দিতে পারেন। তাছাড়া তাঁর কাছে নিজের পালিয়ে যাওয়াটাও বড় নয়। বরং তিনি বড় করে দেখেন এতদিনের হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি, পাঠশালার পড়ুয়াদের ভালোমন্দ। সর্বোপরি মহেন্দ্রর কাছে বাস্তুভিটা শুধুমাত্র মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়; তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক দিনের স্মৃতি, গভীর মমতা, মাটি-মায়ের আদর। কেবল বাড়ির চৌহদ্দিটুকুই নয়, তিনি ভালোবাসেন তাঁর গ্রামকে, গ্রামের সমস্ত মানুষকে, চারপাশের আজন্ম দেখা পরিবেশকে। এই সব কিছু নিয়েই তাঁর অস্তিত্ব। সুতরাং 'বাস্তুভিটা' শব্দটি মহেন্দ্রর কাছে নিয়ে আসে ব্যুৎপত্তি-পরিধির অতিরিক্ত ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনা।

এই ব্যাপ্তার্থটি আরো পরিস্ফুট হয়, যখন এর বিপরীতে নাট্যকার উপস্থাপন করেন শচীনকে। শচীনও পুববাংলার ভূমিপুত্র। কিন্তু সে এখন কলকাতাবাসী। তাই শচীনের কাছে তাদের পুরানো বাস্তুভিটে বর্তমানে অপ্রয়োজনীয়। এর প্রতি তার কোনো টান বা নস্টালজিয়া নেই। এখন এ সম্পত্তিকে সে দেখে অর্থোপার্জনের

উৎস হিসেবে। স্থাবর সম্পত্তিসমূহ সে বিক্রির কথা ভাবে। কেননা তার ধারণায়, দেশভাগের পর পাকিস্তানে হিন্দুর সম্পত্তি বেহাত হয়ে যাবার প্রভূত সম্ভাবনা। প্রথম দৃশ্যে মহেন্দ্রর সঙ্গে কথোপকথনে তার এইসব বৈষয়িক হিসেবই ধরা পড়েছে।

> "মহেন্দ্র। ... শুনলাম, তুমি নাকি বাড়িঘর বেচে দিতে এসেচ?
> শচীন। কি আর করি! এখানে ত আর আসা যাবে না।
> মহেন্দ্র। চৌদ্দ পুরুষের বাস্তুভিটেটা বেচে দেবে?
> শচীন। ইচ্ছে ছিল না; কিন্তু আর রেখেই বা কি করব! বেচে না দিই, বাড়ি বেহাত হয়ে যাবে।"[১১]

শচীন যত সহজে জন্মভূমির মায়া কাটাতে পারে, মহেন্দ্র তা পারেন না। একি বয়সের দোষ, না তার মনের নিজস্ব গড়ন? মানদা যখন স্বামীকে নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সজাগ করে বাস ওঠাতে পরামর্শ দেন, মহেন্দ্র তখন নিজের আর্থিক অক্ষমতার কথা বলে সে প্রসঙ্গে ছেদ টানেন। তাঁর স্পষ্ট সিদ্ধান্ত,—

> "তা সাপই হোক, আর বাঘই হোক, এদের নিয়েই ত থাকতে হবে। আমাদের কি যাবার জায়গা আছে!"[১২]

বাস্তুভিটার সঙ্গে মহেন্দ্র জড়িয়ে নেন পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, ঐতিহ্য-যা তাঁর অস্তিত্বকে প্রজন্মান্তরের ব্যাপ্তি দিয়েছে। ভিটে বেচে যেটুকু টাকা পাওয়া যাবে, তা দিয়ে কলকাতায় যতটুকু জায়গা কেনা যাবে সেটা শচীনের কাছে শুনে মহেন্দ্র বলেন,—

> "এতবড় বাড়ি বেচে পাব আমার এই ঘরখানার মতো একটু ছোট জায়গা। কাজ নেই বাপু, তোমাদের ওখানে গিয়ে-মরি বাঁচি এখানেই থাকব। বাপ পিতাম'র ভিটে ছেড়ে যাব কোথায়?"[১৩]

মানদা স্বামীর অনড় সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। সবিস্ময়ে বলেন,—

> "না, যাবে কোথায়! এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাক। তোমার তো আর মানইজ্জতের ভয় নেই।"[১৪]

মহেন্দ্রর দৃঢ় প্রত্যুত্তর—

> "দেব বইকি, নিশ্চয়ই দেবো।"[১৫]

আসলে মহেন্দ্র মনে করেন, বিপদ দেখলেই ঘরবাড়ি ছেড়ে পালানোটা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সমস্যার সাথে লড়তে হয়। তাছাড়া বিপদটা দু'একজন মানুষের নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের। মহেন্দ্রর এই ভাবনায় বাস্তুভিটা একটি বৃহৎ তাৎপর্য পায়, আর মহেন্দ্র হয়ে ওঠেন সেইসব সংকটাপন্ন মানুষের প্রতিভূ।

বাস্তুভিটা ছাড়ার সমস্যা যে একা মহেন্দ্রর সমস্যা নয়, নাট্যকার তা পরিস্ফুট করেছেন নাটকের দ্বিতীয় দৃশ্যে সোনা মোল্লার সঙ্গে রতনের কথোপকথনে। পূর্ববঙ্গের হিন্দু শ্রমজীবীদেরও সেই একই সঙ্কট। দেশ ছাড়ার জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে লিগপন্থী গোঁড়া মুসলমানরা। কোথাও তাদেরকে আর্থিকভাবে বিপন্ন করা হচ্ছে যাতে তারা নিজেরাই দেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু তাদের পক্ষে ভিটেমাটি ছেড়ে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। লক্ষণীয়, এই দৃশ্যে বাস্তুত্যাগের বিষয়টিকে নাট্যকার পূর্ববঙ্গের সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টিতেও দেখাতে চেয়েছেন। কফিলদ্দি যেন এইসব মানুষের প্রতিনিধি। কেরামত কট্টরপন্থী লিগনেতাদের দ্বারা প্রভাবিত। সে হিন্দুদের পূর্ববঙ্গ থেকে তাড়াবার পক্ষে। কফিলদ্দি সেটা বুঝতে পেরে ঝাঁঝায়—

> "চইল্যা গ্যালে বুঝি তোমার অট্টালিকা উঠবো-ধনদৌলত বাড়বো মিঞা! বলি তোমার যদি আজ বাড়ী ছাইড়া চইলা যাইতে অইত-তোমার ক্যামন লাগতো? জানো, হাদিসে কি কয় জানো?"[১৬]

এইভাবে সারা নাটক জুড়ে বিরাজ করতে থাকে বাস্তুভিটা ত্যাগের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ও প্রতিযুক্তি, বাস্তুভিটা সম্পর্কে নানান মানুষের নানা অনুভূতি ও বিবেচনা। মানুষের দীর্ঘদিনের বসবাসের ঘরবাড়ি তার কাছে কী-এই অনুচ্চারিত প্রশ্নটির যেন জবাব দেবার চেষ্টা আছে নাটকটির মধ্যে। তৃতীয় দৃশ্যে মহেন্দ্রর একটি সংলাপে নাট্যকার ধরিয়ে দিয়েছেন বাস্তুভিটাকে ঘিরে জড়িয়ে থাকা নস্টালজিক মানুষের দুর্মর আবেগ। শচীনের চূড়ান্ত আত্মকেন্দ্রিকতার বিপ্রতীপে মহেন্দ্রর এক গভীর উপলব্ধি এখানে ব্যস্ত। তিনি নিজের চিন্তা করেন না, বরং ভাবিত হন গাঁয়ের ছেলেগুলোর লেখাপড়া নিয়ে। শচীন মহেন্দ্রর এই আহাম্মকিতে বিস্মিত। সে তাই বলে—

> "আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম। যেখানে নিজের জীবন বাঁচবে কিনা ঠিক নেই...সেখানে আপনি ভেবে মরচেন গাঁয়ের ছেলেগুলোর লেখাপড়া হবে কি না! আশ্চর্য আপনাদের দেশের জন্য মায়া!"[১৭]

আর একথার প্রত্যুত্তরে মহেন্দ্র ডুব দেন তাঁর দেশচেতনার গভীরে, অপূর্ব আবেগমথিত হয়ে ওঠে তাঁর কণ্ঠস্বর —

> "মায়া। হ্যাঁ, মায়াই বটে। কিন্তু কার না মায়া হয় বলো। যেখানে ছোট থেকে মানুষ হয়েচি-যে-মাটির সঙ্গে চৌদ্দপুরুষের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, তাকে ছেড়ে যাবো-এ ভাবতেও কষ্ট হয় বাবা...।"[১৮]

বাস্তুভিটা তাই কেবল ইট-কাঠ-পাথরে গড়া বসতবাড়িই নয়, মানুষের আজন্মকালের বাসভূমির সঙ্গে মিশে থাকা এক অব্যক্ত আকুতিও বটে। সমস্ত নাটক জুড়ে নাট্যকার সেই আকুতিকেই নানা চরিত্রে ধরতে চেয়েছেন, এমনকি শেষ দৃশ্যে মানদার মধ্যেও। তাই এর নামকরণটি বস্তুকেন্দ্রিক হয়েও তাৎপর্যপূর্ণভাবে ভাবকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

পরিশেষে বলা যায় নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটকে উদ্ঘাটিত হয়েছে খন্ডিত এক দেশের বাস্তুচ্যুত মানুষের আকস্মিক আঘাত ও যন্ত্রণা। এ নাটক দেখিয়েছে বাংলাদেশের নিরক্ষর মুসলমানরা কীভাবে তাদের আজন্ম হিন্দু প্রতিবেশীদের আপনজন মনে করে জন্মভূমিতে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, তাদের রক্ষা করেছে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়েও। হিন্দু মহাসভা আর মুসলিম লিগের সংকীর্ণ আদর্শ সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি, বরং তাদের নিরন্তর প্ররোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ ধর্মের বাহ্যিক ভেদ ভুলে একে অন্যের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিই 'বাস্তুভিটা' নাটকের মুখ্যবার্তা। পাঠশালার পন্ডিত মহেন্দ্র মাস্টার এ নাট্যকাহিনিতে যেন মহাসভা ও লিগের বিরুদ্ধে নীরব মূর্ত প্রতিবাদ। তিনি কখনই দেশভাগকে সমর্থন করেননি, নির্যাতনের ভয়ে চলেও যেতে চাননি জন্মভূমি ছেড়ে। তাঁকে পা ওঠাতে দিচ্ছিল না জন্মভূমির মায়া, প্রান্তিক মানুষের সীমাহীন দুর্গতি। দেশভাগের প্রত্যক্ষ প্রভাব তো এই গরিব-গুর্বোদের ওপরেই সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছিল। মহেন্দ্র বিত্তবান নন, চিত্তবান। তিনি তাঁর মরমি হৃদয় দিয়েই উপলব্ধি করেছিলেন সকল দুর্গতের দুঃখ, কষ্ট, বেদনা। মহেন্দ্র মাস্টারের এই সর্বানুভূতিই 'বাস্তুভিটা' নাটকের প্রধান সম্পদ। দিগিন্দ্রচন্দ্র নাটকটির সমাপ্তি লগ্নে অনাবিল মনুষ্যত্বকেই জয়যুক্ত করেছেন, জিতিয়ে দিয়েছেন মহেন্দ্র, আমীন মুনশি, রতন, কফিলদ্দি, আব্বাস, সোনা মোল্লাদের যৌথ প্রয়াসকে। চিরকাল আমীন মুনশিদের ভরসা হয়ে উঠেছেন মহেন্দ্র মাস্টাররা, আর সেই মহেন্দ্রদের গাঁয়ে টিকিয়ে রাখতে গিয়ে ইয়াসিনদের লাঠির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছেন আমীনরা। ব্যক্তিস্বার্থ বহির্ভূত সম্প্রীতির এতবড় দৃষ্টান্ত আর কোথায় মিলবে। প্রসঙ্গের ছেদ টানা যাক নাট্যকারেরই লেখা প্রখ্যাত গ্রন্থ নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা-র অন্তর্গত 'ইতিহাসের বিচারে বাংলা নাটক'-এর বিশিষ্ট প্রসঙ্গ 'নাটকে হিন্দু-মুসলিম চিত্র'-এর একটি মূল্যবান অংশ দিয়ে। দিগিন্দ্রচন্দ্র বলেছেন,—

"রাজনৈতিক চক্রান্তে দেশ বিভক্ত হলেও পাঁচিল তুলে বাংলার মনকে খণ্ডিত করা যায়নি। দুই বাংলার এক ভাষা, এক সংস্কৃতি, এক সমাজ আজও পরস্পরকে আকৃষ্ট করছে। বাংলার নাট্যকারদের মনে রয়েছে সেই বাংলার মিলিত জীবন, মিলিত আত্মা ও মিলিত সংস্কৃতির ছবি। তারই স্বতঃস্ফূরণ দেখা যায় বাংলার সামাজিক নাটকে।"[১৯]

**তথ্যসূত্র:**

১. https:..www.millioncontent.com.2021.04.blog-post_76.html
২. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৬, পৃষ্ঠা: ১২
৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১২
৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১১
৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ১২
৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩
৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ২০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
১০. তদেব, পৃষ্ঠা: ৫
১১. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৭
১২. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৮
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা: ১৯
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা: ২৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা: ৩০
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা: ১০৬

**আকর গ্রন্থ:**

১. সনৎকুমার নস্কর (সম্পাদনা), দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তুভিটা, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১৬

**সহায়ক গ্রন্থ:**

১. অজিত কুমার ঘোষ: বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৬২ বঙ্গাব্দ
২. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭
৩. উদয়চাঁদ দাস ও অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, দেশভাগ ও বাংলা উপন্যাস, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম প্রকাশ ২০০৫
৪. কুন্ডল চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যের রূপ ও রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, রত্নাবলী, কলকাতা, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৭
৫. চন্দনকুমার কুণ্ডু: ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ: বাংলা উপন্যাসের দর্শনে, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১২
৬. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্রোড়পত্রঃ মশাল, গণনাট্য, ঊনত্রিশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, জানুয়ারী-মার্চ- ১৯৯৩
৭. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'নেপথ্য ভূমিকা', ত্রিস্রোতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮২
৮. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ -১৯৮২
৯. দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নয়া শিবির, ত্রিস্রোতা, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮২
১০. প্রসূন বর্মন (সম্পাদনা): দেশভাগ দেশত্যাগ প্রসঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত, ভিকি পাবলিশার্স, গুয়াহাটি, ২০১৩
১১. রণবীর পুরকায়স্থ : সুরমা গাঙর পানি, কলকাতা, একুশ শতক, প্রথম প্রকাশ ২০১২
১২. সুজিত চৌধুরী : হারানো দিন, হারানো মানুষ (দ্বিতীয় পর্ব), জ্যোতি প্রকাশনী, শিলচর, ২০১০
১৩. সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায় : দেশভাগ ও বাংলা সাহিত্য: বর্তমান প্রেক্ষিতে, বঙ্গীয় সাহিত্য, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ- ২০১৫